কুরআন ও হাদীসের আলোকে

জিহাদী প্রশিক্ষণের গুরুত্ব

মাওলানা মুহাম্মাদ ওমর ফারুক

কুরআন ও হাদীসের আলোকে

জিহাদী প্রশিক্ষণের গুরুত্ব

মাওলানা মুহাম্মদ ওমর ফারুক।

প্রকাশনায়

রাহ্‌নুমা পাবলিকেশন্স
ঢাকা বাংলাদেশ

অবতরণিকা

বিসমিহী তাআলা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য, যিনি উভয় জাহানের প্রতিপালক।। দুরুদ ও সালাম মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি, যিনি নবী-রাসূলগণের সর্দার। অবারিত রহমত বর্ষিত হোক তাঁর পরিবার পরিজনদের উপর ও তাঁর সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.) এর উপর।

হামদ ও সালাতের পর–

জিহাদ শরীয়তের এমন এক সুস্পষ্ট বিধান, যার জন্য আল্লাহ তাআলা ছয় শতের বেশী আয়াত অবতীর্ণ করে দিয়েছেন। জিহাদে বের না হলে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে তাও স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন। মহানবী (স.) জিহাদের ব্যাপারে অসংখ্য হাদীস বর্ণনা করেছেন। যার মধ্যে জিহাদের গুরুত্ব, ফাযায়িল, মাসাইল ও জিহাদ পরিত্যাগের পরিণতি স্বচ্ছভাবে ফুটে উঠেছে। এক হাদীসে রাসূল (স.) ইরশাদ করেছেন – "এমন একটি সময় আসবে, যখন তোমাদের (মুসলমানদের) মূলউৎপাটন করার জন্য কাফেররা একে অপরকে ডাকতে থাকবে। যেভাবে কোন ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে খাবারের প্লেটের দিকে ডাকা হয়।" রাসূলের এই বাণী আজ অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হচ্ছে। আজ সারা বিশ্বের কুফরী শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আজ মুসলমানরা নির্যাতিত

নিষ্পেষিত মুসলমানদের রক্তের স্রোত বয়ে যাচ্ছে আজ মুসলিম জনপদ গুলোতে। নির্যাতিতা মা-বোনদের আত্মচিৎকারে আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে আসছে। তবে কেন মুসলমানরা এত মুসীবতের শিকার এবং তা থেকে মুক্তির উপায় কী?

প্রিয় নবী (সাঃ) এর কারণ ও তা থেকে পরিত্রাণের উপকরণও বাতিয়ে দিয়েছেন। ইরশাদ করেছেন – "যখন তোমরা জিহাদকে পরিত্যাগ করবে, তখন তোমাদের উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেয়া হবে, যতক্ষণ না তোমরা ফিরে আসবে তোমাদের দ্বীন তথা জিহাদের প্রতি।" এ বাণী থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, এই নির্যাতন-নিপিড়ন ও লাঞ্ছনা-গঞ্জনার কারণ জিহাদ পরিত্যাগ করা। আর এর প্রতিকার জিহাদকে আকড়ে ধরা। সুতরাং জিহাদ ছাড়া এ পরিস্থিতি থেকে মুক্তির বিকল্প কোন পথ নেই। আর এ কথা দিবালোকের ন্যায় পরিস্কার যে, জিহাদের পূর্বে জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করা অবশ্যকীয়। যেমনিভাবে আল্লাহ তায়ালা জিহাদকে অকাট্যভাবে ফরয করেছেন, তেমনিভাবে জিহাদের প্রস্তুতি নেয়াকেও ফরয করেছেন। এবং এটা ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুদের ভীত-সন্ত্রস্তের উপকরণ বলে আখ্যা দিয়েছেন। এবং রাসুল (সা.) এ প্রসঙ্গে বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন। বর্তমানে বাজারে এ বিষয়ের উপর যে বই-পুস্তক রয়েছে তা অপ্রতুল। তাই সময়ের এই চাহিদা মিটাতে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

সম্মানিত পাঠক!

যদি একজন মানুষও এই বই পড়ে উপকৃত হন, কিছু দিক নির্দেশনা পান এবং নিজেকে একজন মুজাহিদ রূপে গড়ে তোলেন, তবে আমরা আমাদের এই মেহ্নতকে স্বার্থক জ্ঞান করব। এই বই পড়তে গিয়ে যদি কোথাও কোন ভূল চোখে পড়ে তবে জানিয়ে দেয়ার অনুরোধ রইল।

অবশেষে, সমস্ত ভুল-ত্রুটি থেকে ক্ষমা চেয়ে মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন এই বইয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে কবুল করে নেন।

---- আমীন

ইয়া রাব্বাল আলামীন

ওমর ফারুক

০২/১০/০৪ইং:

সূচীপত্র

জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করা ফরয

জিহাদের প্রস্তুতি নেয়ার ব্যাপারে মহান আল্লাহর নির্দেশ ঃ

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ ـ

অর্থাৎ "কাফিরদের বিরুদ্ধে তোমরা যত পার শক্তি ও অশ্ব বাহিনীর প্রস্তুতি নাও, যদ্বারা তোমরা সন্ত্রস্ত করবে আল্লাহর শত্রুকে ও তোমাদের শত্রুকে, এদের ব্যতীত অন্যদেরকে, যাদেরকে তোমরা জান না– জানেন আল্লাহ।" (আনফাল : ৬০)

এ আয়াতের প্রতিটি বিষয়ের আলাদা আলাদা ব্যাখ্যা দিলে আশা করি আলোচ্য বিষয়ের উপর স্বচ্ছ ধারণা লাভ করা যাবে।

তবে এর পূর্বে একটি নীতিমালা জেনে রাখা দরকার, তা হল এই যে, শরীয়তের পরিভাষায় 'আমর' তথা নির্দেশ বাচক শব্দ দ্বারা 'ফরয' প্রমাণিত হয়। (যখন তা অন্য অর্থে ব্যবহার হওয়ার কোন ইঙ্গিত না থাকে)

যেমন, আমরা নামাযকে ফরয কেন বলি? এজন্য যে, কুরআন মাযীদে اقيموا শব্দ এসেছে। যা 'আমর' তথা নির্দেশ বাচক শব্দ। সুতরাং নামায ফরয। এমনিভাবে যাকাত এ জন্য ফরয যে, কুরআনুল কারীমে اتوا الزكوة শব্দ ব্যবহার হয়েছে। যা নির্দেশ বাচক শব্দ। সুতরাং যাকাত আদায় করা ফরয।

আয়াতের ব্যাখ্যা ঃ

اعدوا নির্দেশ বাচক শব্দ।

অর্থাৎ- 'তোমরা প্রস্তুতি গ্রহণ কর'

اعدوا বলে আল্লাহ তাআলা জিহাদের জন্য প্রস্তুতি নেয়ার আদেশ করেছেন। সুতরাং জিহাদের প্রস্তুতি নেয়া ফরয। আর আল্লাহ তাআলা'র যে কোন আদেশ-নির্দেশ মুসলমানদের জীবনের কল্যাণের গ্যারান্টি বহন করে। আর আল্লাহ'র আদেশ অমান্য করা আত্মঘাতির শামিল।

لهم অর্থ এখানে 'কাফিরদের জন্য' 'বা মুসলমানদের শত্রুদের জন্য।'

অর্থাৎ- যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানদের শত্রু কাফির-মুশ্‌রিক, ইহুদী-খ্রীষ্টানদের কাছে শক্তি থাকবে এবং তারা তা মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করতে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানদের কর্তব্য হবে তাদের অপেক্ষা আরো বেশী শক্তি সঞ্চয় করে প্রস্তুত থাকা।

ما استطعتم অর্থ 'যত পার।'

আল্লাহ্ তাআলা জিহাদের প্রস্তুতিকে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণে সীমাবদ্ধ করেননি, বরং মুসলমানদের আদেশ করেছেন যে, তোমরা যত পার শক্তি সঞ্চয় করতে থাক। কারণ, শক্তি যতবেশী হবে, মুসলমানদের বিজয়ও ততোধিক তরান্বিত হবে এবং আল্লাহর দ্বীন সমুন্নত করার দায়িত্ব ততো ভালভাবে আদায় করা যাবে। আর কুফরী শক্তির পতন ঘটবে এবং বাতিল পন্থিরা নির্মূল হয়ে যাবে।

কারণ, ইসলামের শত্রুরা সব সময় মুসলমানদের ঘায়েল করার জন্য ওঁৎ পেতে থাকে। মুসলমানরা যাতে ধ্বংস হয়ে যায় কিংবা তাদের পদানত হয়, এর জন্য তারা তাদের সর্বশক্তি ব্যয় করে এবং সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাকে। তাই মুসলমানদের জিহাদ ইসলাম-বিরোধী সকল শক্তির সাথে। মুসলমানরা একাই স্বতন্ত্র এক জাতি। আর কাফেররা সবাই মিলে এক জাতি। এ কারণে আল্লাহ তাআলা জিহাদের প্রস্তুতির বেলায় কোন সীমা নির্ধারণ করে দেননি, বরং আদেশ করেছেন,তোমরা যত পার প্রস্তুতি নিতে থাক, যাতে কখনো তোমাদের অপদস্থ হতে না হয়।

قوة অর্থ 'শক্তি' قوة এর ব্যাখ্যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ ভাষায় এভাবে করেছেন –

اَلَا اِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ – الا ان القوة الرمي – الا ان القوة الرمى -

অর্থাৎ – জেনে রাখ! শক্তি নিক্ষেপণের মধ্যেই। শক্তি নিক্ষেপণের মধ্যেই। শক্তি নিক্ষেপণের মধ্যেই। (মুসলিম শরীফ খন্ড ২ পৃঃ ১৪৩)

(অর্থাৎ - শক্তি বলতে নিক্ষপণকেই বুঝায়)

তাই 'শক্তি' বলতে সব রকম নিক্ষেপণযোগ্য অস্ত্রকেই বুঝায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম– এর যুগে সাহাবায়ে কিরাম যে সকল অস্ত্র ব্যবহার করেছেন, তা-ও এর অন্তর্ভুক্ত এবং পরবর্তীতে যেসব অস্ত্র আবিষ্কৃত ও ব্যবহৃত হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে তা-ও এর আওতাভুক্ত। এ কারণে সর্ব প্রকার শক্তি অর্জন করা মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য। আবার এই সমর-শক্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল –'নিক্ষেপণ শক্তি', বর্তমানে যা রকেট, মিসাইল ও বোমা আকারে ব্যবহার করা হয়।

উপমহাদেশের প্রখ্যাত মুফাসসির মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহঃ) তাফসীরে 'মাআরিফুল কুরআনে' উল্লিখিত আয়াতটির তাফসীর এভাবে করেন ঃ

واعدوا لهم ما استطعتم

অর্থাৎ – কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুত করে নাও। এ ক্ষেত্রে যুদ্ধোপকরণ তৈরী করার সাথে ما استطعتم" এর শর্ত আরোপ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তোমাদের সফলতা লাভের জন্য এটা অপরিহার্য নয় যে, তোমাদের প্রতিপক্ষের নিকট যে ধরনের এবং যে পরিমাণ উপকরণ রয়েছে তোমাদেরকেও ততটাই অর্জন করতে হবে, বরং সামর্থ্য অনুযায়ী যা কিছু উপকরণ জোগাড় করতে পার তাই সংগ্রহ করে নাও, সে টুকুই যথেষ্ট। আল্লাহর সাহায্য ও সহায়তা তোমাদের সঙ্গে থাকবে।

অতঃপর সে উপকরণের কিছুটা বিশ্লেষণ এভাবে করা হয়েছে – من قوة অর্থাৎ – মুকাবিলা করার শক্তি সঞ্চয় কর। এতে সমস্ত যুদ্ধোপকরণ,

অস্ত্র-শস্ত্র, যানবাহন প্রভৃতি অন্তর্ভূক্ত এবং শরীর চর্চা ও সমর বিদ্যা শিক্ষা করাও অন্তর্ভুক্ত। কুরআন কারীম এখানে তৎকালে প্রচলিত অস্ত্র-শস্ত্রের কোন উল্লেখ করেনি, বরং ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ 'শক্তি' ব্যবহার করে ইঙ্গিত দিয়েছে, 'শক্তি' প্রত্যেক যুগ, দেশ ও স্থান অনুযায়ী বিভিন্ন রকম হতে পারে। তৎকালীন সময়ের অস্ত্র ছিল তীর, তলোয়ার, বর্শা প্রভৃতি। তারপরে বন্দুক–তোপের যুগ এসেছে। তারপর এখন চলছে বোমা ও রকেটের যুগ। শক্তি শব্দটি এ সব কিছুতেই ব্যাপক।

সুতরাং আজকের মুসলমানদের সামর্থ্যানুযায়ী পারমাণবিক শক্তি, ট্যাংক, জঙ্গী বিমান ও সাবমেরিন (submarine) সংগ্রহ করা উচিত। অতএব যে কোন বিদ্যা ও কৌশল শিক্ষা করার প্রয়োজন হবে, সে সবই যদি এই নিয়তে হয় যে, তার মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুকে প্রতিহত করা এবং কাফিরদের মুকাবিলা করা হবে, তাহলে তা-ও জিহাদেরই শামিল।

বিশুদ্ধ হাদীস সমূহে রাসূলুল্লাহ (স.) যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করা এবং সেগুলো ব্যবহার করার কায়দা–কৌশল অনুশীলন করাকে বিরাট ইবাদত ও মহাপূণ্য লাভের উপায় বলে সাব্যস্ত করেছেন। (তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন খন্ড -৪, পৃ: ২৭২)

ومن رباط الخيل "অশ্ব বাহিনী প্রস্তুত কর"

শক্তি সঞ্চারের আদেশ দেয়ার পর আল্লাহ তাআলা অশ্ব বাহিনী প্রস্তুত করার আদেশ দিয়েছেন।

জিহাদের ময়দানে ঘোড়ার একটি বিশেষ গুরুত্ব আছে। মহানবী (স.) ঘোড়া পালনের অত্যাধিক ফযীলতের কথা বলেছেন।

বুখারী শরীফের এক বর্ণনা মতে নবী কারীম (স.) বলেছেন

الْخَيْلُ مَعْقُوْدٌ فِيْ نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ـ

"ঘোড়ার কপালে কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ নিহিত রাখা হয়েছে।"

(বুখারী শরীফ, খন্ড - ১পৃ ঃ ৩৯৯)

এখানে 'কল্যাণ দ্বারা উদ্দেশ্য হল– জিহাদের পরকালীন পুরষ্কার কিংবা গনীমতের সম্পদ।

অন্য এক হাদীসে আছে –

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رَضِ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اِحْتَبَسَ فَرَسًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِيْمَانًا بِاللّٰهِ وَتَصْدِيْقًا بِوَعْدِهٖ فَاِنَّ شَبْعَهٗ وَرِيَّهٗ وَرَوْثَهٗ وَبَوْلَهٗ فِىْ مِيْزَانِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ – (بخارى شريف)

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন – "যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার উপর পরিপক্ব ঈমান রাখে এবং তাঁর ওয়াদাকে সত্য জ্ঞান করে জিহাদের উদ্দেশ্যে ঘোড়া প্রতিপালন করে, কিয়ামতের দিন ঘোড়ার আহার্য, পানি ও মল-মূত্র সে ব্যক্তির আমলের পাল্লায় রাখা হবে।

(বুখারী শরীফ খন্ড ১, পৃ: ৪০০)

ফায়দা ঃ হাদীসটি থেকে বুঝা গেল, যে ব্যক্তি বাড়ীতে থেকে শুধু এ নিয়তে ঘোড়া তৈরী রাখে যে, প্রয়োজন হলে এর উপর সওয়ার হয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে, কিয়ামতের দিন তার আমল নামায় ঐসব বস্তু মাপা হবে, যা সে ব্যক্তি ঘোড়াটাকে খেতে এবং পান করতে দিয়েছে।

এমনকি ঘোড়াটির মল-মূত্র পর্যন্ত সেদিন ওজন করা হবে।

ঐ যুগে জঙ্গী ঘোড়া জিহাদের ময়দানে সেই ভূমিকা রাখতো যে ভূমিকা রাখে আজকের বোমারু বিমানগুলো। ব্যস! সে সময় ঘোড়া যুদ্ধের জন্য বিমান ছিল। এ কারণেই একশ'টি উটের বিনিময়ে একটি ঘোড়া বিক্রি হত। আর এ জন্যই মহান আল্লাহ স্বীয় গ্রন্থ 'আল-কুরআনে' বিশেষভাবে ঘোড়ার আলোচনা করেছেন এবং রাসূল (স.) এর পবিত্র হাদীসের ভান্ডারে ব্যাপকভাবে ঘোড়ার ফযীলত সমূহ আলোচিত হয়েছে।

অপর এক হাদীসে এসেছে–

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে, হুযূর (স.) প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ঘোড়াগুলোর মাঝে ঘোড়দৌড় ও প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছেন। আর সে প্রতিযোগিতার স্থান ছিল 'হাফ্‌ইয়া' নামক স্থান থেকে শুরু করে 'সান্‌ইয়াতুল ওদা' পর্যন্ত। উভয় স্থানের মাঝে ছয় মাইলের দুরত্ব ছিল। আর অপ্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ঘোড়াগুলোর মাঝে 'সানইয়াতুল ওদা' থেকে

মসজিদে 'বনী জুরুইক' পর্যন্ত প্রতিযোগিতা করান। উভয় স্থানের মাঝে এক মাইলের দূরত্ব ছিল। (বুখারী, মুসলিম)

ফায়দা ঃ হুযূর (স.) এই প্রতিযোগিতা নিজ তত্ত্বাবধানে করিয়েছেন। দু'ধরনের ঘোড়া এতে অংশ নেয়। কিছু ছিল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ঘোড়া, যেগুলোর প্রতিযোগিতার জন্য ছয় মাইল দীর্ঘ দূরত্ব নির্ধারণ করা হয়। আর কিছু ছিল অপ্রশিক্ষণপাপ্ত ঘোড়া, যেগুলোর জন্য শুধু এক মাইলের দূরত্ব নির্ধারণ করা হয়।

সে যুগে জিহাদের ময়দানের জন্য ঘোড়া বর্তমান যুগের জেড বিমানের কাজ দিত। রাসূল (স.) এর সামনে অগ্রসর হয়ে কাফিরদের সাথে লড়াইয়ের প্রয়োজন হত। তাই তিনি পরিপূর্ণ রূপে সেগুলোকে প্রস্তুত করান। নিজেও ট্রেনিং এ অংশ নেন এবং সাহাবায়ে কিরামকেও তৈরী করান। এতে বুঝা গেল যে, এই প্রস্তুতি মুসলিম শাসকগণ ও জন সাধারণ সকলের জন্য অপরিহার্য।

উল্লিখিত দু'টি হাদীসের আলোকে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেল যে, সে যুগের ঘোড়ার স্থলে বর্তমান যুগে রণক্ষেত্রে যে সব বস্তু ব্যবহার হয় – যেমন, বোমারু বিমান, জঙ্গী বিমান, বিভিন্ন ধরনের গাড়ি, হুন্ডা ইত্যাদি – সামর্থ্যানুযায়ী এগুলো সংগ্রহ করা ও এগুলোর প্রশিক্ষণ নেয়া আবশ্যকীয়। এবং কোন ব্যক্তি যদি জিহাদের নিয়তে এগুলো প্রস্তুত করে রাখে তবে, সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় সাওয়াবের অধিকারী হবে, যে ব্যক্তি জিহাদের নিয়তে ঘোড়া প্রস্তুত করে রাখে।

হাদীসগুলো থেকে একথাও জানা গেল যে, জেহাদের উদ্দেশ্যে যত কিছুই তৈরী করা হবে, তার প্রতিদান ও সম্মানী পাওয়া যাবে। এমনিভাবে জিহাদে অগ্রণী ভূমিকা পালন করার নিয়তে দৈহিক শক্তি সঞ্চারের জন্য যে মুজাহিদ নিজের জন্য টাকা-পয়সা খরচ করবে এর প্রতিদান ও সম্মানী তার আমলনামাতেও সংযোজিত হবে।

ترهبون به عدو الله وعدوكم "অস্ত্র সংগ্রহ ও শক্তি সঞ্চয়ের মাধ্যমে ইসলামের শত্রুদের মনে ভীতি সঞ্চার করবে, যাতে তারা মুসলমানদের সমীহ করে চলে। তাদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নিতে অক্ষম থাকে।"

আয়াতে কারীমার এ অংশটুকু দ্বারা বুঝা গেল যে, সব সময়ের জন্য

মুসলমানদের এমন অস্ত্র ও এত শক্তি সঞ্চয় করে রাখতে হবে, যার ফলে ইসলামের শত্রুরা সব সময় সন্ত্রস্ত থাকে।

আর বাস্তবতা হল এই যে, কাফির ও ইসলামের শত্রুরা যেহেতু বস্তুবাদী তাই তাদের দৃষ্টি বস্তুর প্রতি নিবদ্ধ। এ কারণেই তারা বস্তু ও বাহ্যিক উপকরণ দ্বারা সন্ত্রস্ত হয়। তারা রূহানিয়্যাত ও আধ্যাত্মিকতা দ্বারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয় না। তাদের নিকট আল্লাহ ওয়ালাদের হাজারো বদ দোয়া, হাজারো বয়ান–বক্তৃতা অকেজো ও প্রভাবহীন। কিন্তু এর স্থলে তারা একটি টি,টি পিস্তল অথবা একটি ক্লাশিনকোভের গুলি দ্বারা প্রকম্পিত হয়ে পড়ে।

তাই সেই বস্তুবাদীদের মুকাবিলার জন্য মহান আল্লাহ বস্তু ও বাহ্যিক উপকরণ প্রস্তুত করার নির্দেশ দিয়েছেন।

ফলকথা– মুসলমানদের এতটুকু শক্তি থাকা আবশ্যক, যার ফলে শত্রুরা অবদমিত থাকে, এবং মুসলমানরা ঈমানের সাথে নিরাপদে বাস করতে পারে। আর এ বিষয়ে মুসলমানরা অবহেলা করলে নিঃসন্দেহে দুশমন তাদের ঘাড়ে চেঁপে বসবে এবং তাদের জান-মাল ও ঈমান হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়বে।

যেমন বর্তমানে হচ্ছে। এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। কথাই আছে, 'জোর যার মুল্লুক তার' যার শক্তি আছে সবাই তার কাছে মাথা নত করতে বাধ্য। ইসলামের শুরু লগ্নে পুরো পৃথিবীর মধ্যে রোম-পারস্যবাসীরা ছিল প্রভাবশালী। কায়সার-কিসরার নাম শোনলে পুরো পৃথিবী কাঁপতো। তাদের নাম শোনলে আরবের লোকদের শরীরে কম্পন সৃষ্টি হয়ে যেতো। তাদের সামনে মাথা নত করতো। যখন ইসলাম শক্তিশালী হয়, তখন রোম-পারস্যের পতন ঘটে এবং কায়সর-কিসরার ন্যায় প্রভাবশালী ব্যক্তিরা আরবের বেদুঈনদের সামনে মাথা নত করতে বাধ্য হয়। এভাবে অল্প কিছু দিনের মধ্যে অর্ধ জাহান মুসলমানরা নিজেদের কব্জায় নিয়ে নেয়।

অতঃপর এক সময় পৃথিবীতে বৃটিশদের উত্থান ঘটে। পৃথিবীর পরা শক্তি হয়ে যায় তারা। তখন বৃটিশদের ভয়ে মানুষ থর থর করে কাঁপত। সম্মেলিত ভাবে তো দূরের কথা একাকিও কেউ বৃটিশদের সমালোচনার দুঃসাহস করত না। কারণ, কেউ তাদের সমালোচনা করেছে জানতে

পারলে তার আর নিস্তার নেই। কিন্তু উপমহাদেশের উলামায়ে কিরাম যখন স্বশস্ত্র শক্তি নিয়ে তাদের মুকাবিলায় নেমে পড়েন, তখন তারা লেজ গুটিয়ে পালাতে বাধ্য হয়। এবং আস্তে আস্তে তাদের ক্ষমতা সংকীর্ণ হয়ে পৃথিবীর এক কোনে অবস্থান নেয়।

এরপর পৃথিবীতে রাশিয়ার অভ্যুদয় ঘটে। সোভিয়েত ইউনিয়নের নামে এক পরাশক্তি, সামরিক শক্তিবলে পৃথিবী জয় দেখে। তাদের সেই শক্তির সামনে পুরো পৃথিবী খড়-কুটার ন্যায় ছিল। আমেরিকা, ব্রিটেনের ন্যায় পরাশক্তিরাও তাদের কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হয়। যে রাশিয়া ছিল সব ধরনের ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রাণ কেন্দ্র। মুসলিম মহা মনীষীদের জন্ম ভূমি। সেখানে ইসলামী শিক্ষার উপর বাধ্য-বাধকতা সৃষ্টি করা হয়। স্ব-শক্তিবলে মসজিদগুলোতে তালা লাগিয়ে দেয়া হয়। দ্বীনি শিক্ষা কেন্দ্র গুলো বন্ধ করে দেয়া হয়। ইসলামী জীবন-যাপনের উপর বাধা সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু যখন আফগানিস্তানের মজলুম মুসলমানরা নিজেদের শক্তি-সামর্থ্য নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, তখন সে রাশিয়া ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে প্রায় ১৭টি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। আজ পৃথিবীর কোথাও সোভিয়েত ইউনিয়নের নাম গন্ধও নেই। রাশিয়া একটি কান্ডহীন গাছ ও পরাজিত শক্তি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আজ পৃথিবীতে আমেরিকার উত্থান কাল। নিজ শক্তিবলে পুরো পৃথিবীতে আধিপত্য বিস্তার করেছে। সবার মোড়ল সেজে বসেছে। আমেরিকার শক্তির সামনে সবাই ভয়ে থর থর। তার শক্তির সামনে সবাই মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছে। বলা বাহুল্য যে, প্রত্যেকটি শক্তির মূলে ছিল, সর্বাধিক সংখ্যক সেনা বাহিনী নিয়োগ, তাদের সর্বোচ্চ সামারিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, সর্বোচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন সমরাস্ত্রের মালিক হওয়া, সীমাহীন ব্যয় বহুল যুদ্ধের অর্থ যোগানের জন্য ব্যবসায়ী কেন্দ্রগুলো নিজেদের দখলে নেয়া, প্রচার মিডিয়া শক্তি নিজেদের আয়ত্তে নেয়া

সম্মানিত পাঠক!

দীর্ঘ এই আলোচনা দ্বারা একথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, শক্তি যার থাকবে

সবাই তার অনুগত হবে এবং তাকে সবাই ভয় করবে এটা আজকের কথা নয়, বরং তা পৃথিবীর শুরু লগ্ন থেকে আজকের দিন পর্যন্ত অব্যাহত।

বর্তমান পৃথিবীতে বহু প্রভাব প্রদর্শনকারী, বহু বুযুর্গানে দ্বীন রয়েছে তাদের প্রভাবে আজ কুফরী শক্তি প্রভাবিত হচ্ছে না। কিন্তু এক শায়খ উসামা, বর্তমান বিশ্বের এমন এক বুযুর্গ, এমন এক আল্লাহওয়ালা যিনি সত্যিকারের আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জন করেছেন। শরীয়তের নির্দেশিত সামরিক শক্তিও অর্জন করেছেন এবং পাশাপাশি পরাশক্তির মুকাবিলা করার মত শক্তি-সামর্থ্য নিয়ে সামনে অগ্রসর হচ্ছেন। তাই আজ সকল কুফরী শক্তি তাঁকে ভয় করছে। বিশ্বের সবচে পরাশক্তিও তাঁর ভয়ে সর্বদা প্রকম্পিত। তাদের চোখে আজ ঘুম নেই। তারা আজ বিকারগ্রস্থ।

সুতরাং যখন মুসলমানরা ঈমানী শক্তি অর্জনের পাশাপাশি নিজেদের সামরিক শক্তিকে মজবুত করবে তখন পুরো পৃথিবীতে এমনি তার প্রভাব পড়বে। মুসলমান নিজেরা শান্তির নিশ্বাস ফেলার সুযোগ পাবে। অন্যরা ইসলামকে আশ্রয় স্থল হিসাবে গ্রহণ করে ইসলামের মাহাসিন দেখে ইসলামে দিক্ষীত হওয়ার সৌভাগ্য পাবে।

واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم এদের ব্যতীত অন্যদেরকে, যাদেরকে তোমরা জান না –আল্লাহ তাদের চেনেন।"

আয়াতের এই অংশটুকুর ব্যাখ্যায় মুফতী শফী (রহঃ) তাফসীরে মাআরিফুল কুরআনে লিখেন –

'অতঃপর মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন যে, যুদ্ধ জিহাদের প্রস্তুতির মাধ্যমে যে সমস্ত লোকদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করা উদ্দেশ্য এদের মধ্য হতে কতককে তো মুসলমানরা চিনে। আর তারা ছিল ঐ সমস্ত লোক যাদের সাথে মুসলমানদের লড়াই চলছিল, অর্থাৎ মক্কার কাফির ও মদীনার ইহুদীরা। আর কিছু লোক এমনও ছিল যাদের ব্যাপারে মুসলমানরা এখনও জানতে পারেনি। এর দ্বারা উদ্দেশ্য–পুরো পৃথিবীর কাফির ও মুশরিক যারা এখনো মুসলমানদের মুকাবিলায় আসেনি; তবে ভবিষ্যতে তাদের সাথেও

সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হবে।

কুরআনুল কারীমের এই আয়াতটি বলে দিয়েছে যে, যদি মুসলমানরা নিজেদের বর্তমান শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি গ্রহণ করে, তবে এর প্রভাব শুধু মাত্র তাদের উপর পড়বে, তাই নয়; বরং দূর–দূরান্তের কাফির, কিস্‌রা ও কায়সর প্রমুখ এর উপরও এর প্রভাব পড়বে। আর বাস্তবে এমনই হয়েছিল। খুলাফায়ে রাশেদার যুগে তারা পরাজিত ও ভীত- সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল। (মাআরিফুল কুরআন, খন্ড–৪পৃ; ২৭৩)

ফায়দা ঃ সুতরাং আজকের মুসলমানরাও যদি সামর্থ্যানুযায়ী অস্ত্র সংগ্রহ ও শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে, তবে যে সমস্ত ইসলামের শত্রু এখনও মুসলমানদের মুকাবিলায় আসেনি তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে এবং এই প্রস্তুতির কার্যকর প্রভাব তাদের উপর পড়বে। আর বাস্তবে তা-ই পরিলক্ষিত হচ্ছে।

যারা বাস্তবেই জিহাদে যাওয়ার ইচ্ছা রাখে তারা জিহাদের প্রস্তুতিও গ্রহণ করে।

وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ۔

অর্থ ঃ “আর যদি তারা জিহাদে বের হওয়ার নিয়ত করত, তবে অবশ্যই তার জন্য কিছু সরঞ্জাম প্রস্তুত করত। কিন্তু তাদের উথান আল্লাহর পছন্দ নয়, তাই তাদের নিবৃত রাখলেন এবং আদেশ হল বসে থাকা লোকদের সাথে তোমরা বসে থাক।” (সূরা-তাওবা, আয়াত-৪৬)

আয়াতের পটভূমি ঃ

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিহাদের ঘোষণা দেয়ার পর একদিকে সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.) প্রতিযোগিতার সাথে ঐ মহান কাজে অংশ গ্রহণের চেষ্টা করতেন। অক্ষম হওয়া সত্ত্বেও অনেকে এই মহান কাজে এগিয়ে আসতে চাইতেন এবং মহিলারা তাদের মাসূম বাচ্চাদেরকেও জিহাদের জন্য রাসূলের সামনে পেশ করতেন। অপরদিকে মুনাফিকরা জিহাদে অংশ গ্রহণের ব্যাপারে টাল-বাহানা শুরু করে দিত এবং নানা

ধরনের অজুহাত বের করে এই মহান দায়িত্ব থেকে গা-বাঁচাবার চেষ্টা করত। পবিত্র কুরআন তাদের এসব অজুহাত প্রত্যাখ্যান করেছে। তারপরও মুনাফিকরা বলে বেড়াত যে, আমাদের তো জিহাদে যাওয়ার ইচ্ছা আছে। কিন্তু করব কী? একেক সময় একেকটা সমস্যা এসে দাড়ায়, তাই যেতে পারি না। এ জন্য মহান আল্লাহ উল্লিখিত আয়াতের মাধ্যমে একটি মূলনীতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন যে, জিহাদে যাওয়ার ইচ্ছা থাকার দাবী কখন গ্রহণ যোগ্য হবে।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা শাব্বির আহমাদ উসমানী (রহঃ) লিখেন ঃ

"তাদের ঘর থেকে বের হওয়ার ইচ্ছা-ই নেই। নতুবা তার জন্য কিছু সরঞ্জামাদী প্রস্তুত করত। জিহাদের আদেশ শোনতেই মিথ্যে ওজর-আপত্তি পেশ করত না। বাস্তব বিষয় হল এই যে, আল্লাহ তাআলা তাদের (জিহাদে) অংশ গ্রহণ করাটাকে পছন্দই করেননি। এরাতো সেখানে যায় ফিত্না সৃষ্টি করার জন্য। আর না যাওয়া অবস্থায় তারা বুঝতে পারবে যে, আল্লাহ্র ফযলে মুমিনদের এক বিন্দু পরিমাণ তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ নেই। তাই আল্লাহ তাদেরকে মুজাহিদদের সারিতে শামিল হওয়া থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছেন। এভাবে যে, বঞ্চিত করে দেয়ার শাস্তি তাদের উপরই বর্তাবে। কেমন যেন তাদেরকে চুড়ান্ত ভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, যাও! মহিলা, বাচ্চা ও পঙ্গুদের সাথে ঘরে গিয়ে জমে বসে থাক"। (তাফসীরে উসমানী পৃঃ ২৫৭)

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফতী শফী (রহঃ) বলেন ঃ

"অর্থাৎ ঃ যদি বাস্তবেই তারা জিহাদে বের হওয়ার ইচ্ছা রাখত, তবে আবশ্যকীয়ভাবে তারা প্রস্তুতিও গ্রহণ করত। কিন্তু তারা কোন প্রস্তুতি গ্রহণ করেনি। যদ্বারা বুঝা গেল যে, তাদের এই ওযর ছিল মিথ্যে বাহানা। বস্তুত ঃ তাদের জিহাদে বের হওয়ার ইচ্ছা-ই ছিল না।

গ্রহণ যোগ্য ওযর ও বাহানার পার্থক্য ঃ

এ আয়াত থেকে একটি গরুত্বপূর্ণ মূলনীতির সন্ধান পাওয়া যায়। যার দ্বারা প্রকৃত ওযর ও বাহানার মধ্যে পার্থক্য করা যাবে। তা হল, সেই লোকদের ওযর প্রকৃত গ্রহণযোগ্য যারা (আগ থেকে) আদেশ পালনে

প্রস্তুত; কিন্তু কোন আকস্মিক দুর্ঘটনার ফলে পরে অসমর্থ হয়ে পড়ে। মা'যুরগণের সকল বিষয় এ নিরিখে যাচাই করা যাবে। কিন্তু আদেশ পালনে যার কোন ইচ্ছা ও প্রস্তুতি নেই, পরে তার যদি কোন ওযর উপস্থিত হয়, তবে এটা হবে "গোনাহের ওযর গোনাহের চেয়ে নিকৃষ্ট" এর এক দৃষ্টান্ত'। এটাকে গ্রহণযোগ্য ওযর মনে করা যাবে না। কেউ জুম্আর নামাযে শরীক হওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছে, কিন্তু যেই মাত্র চলার ইচ্ছা করল, হটাৎ এক ঘটনায় তার গতি স্তব্ধ হয়ে গেল। এ ধরনের ওযর গ্রহণযোগ্য এবং এতে আল্লাহ মা'যুর লোকদের পূর্ণ সাওয়াব দান করেন। কিন্তু যে জুমআর কোন প্রস্তুতিই নেয়নি, তার কোন ওযর উপস্থিত হলে তা হবে বাহানার নামান্তর।

বাস্তব হল এই যে, আদেশ পালনে প্রস্তুতি নেয়া বা না নেয়ার দ্বারাই গ্রহণযোগ্য ওযর ও বাহানার মধ্যে ফায়সালা করা যাবে। মৌখিক বুলিতে কিছু আসে যায় না। (মাআরিফুল কুরআন খন্ড - ৪পৃঃ ৩৮৫)

ফায়দাঃ আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত মূলনীতি থেকে একথা পরিষ্কার জানা গেল যে, যদি কেউ দৈহিক ও সামরিক দিক দিয়ে জিহাদের প্রস্তুতি নিল, কিন্তু পরে কোন ওযর দেখা দিল, যেমন - হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ল কিংবা জিহাদে যাওয়ার মত সামর্থ্য তার নেই এবং মুজাহিদদের জিহাদে যেতে দেখে তার মন ছটফট করছে, তা হলে এমন ব্যক্তির ওযর গ্রহণযোগ্য। কিন্তু সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি জিহাদের প্রস্তুতি নিল না, জিহাদে না যাওয়ার ব্যাপারে তার কোন বাহানা-ই গ্রহনযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। এমন ব্যক্তি মিথ্যাবাদী এমন লোকদেরকে জিহাদের ময়দানে নেয়াও আল্লাহর অপছন্দ। তাই আল্লাহ তা'আলা বাড়িতে মহিলাদের সঙ্গে তাদেরকে বসিয়ে রাখেন।

এই নীতির আলোকে প্রত্যেকের উচিত নিজেকে নিরীক্ষা করে নেয়া, যারা জিহাদের ফাযায়িল ও গুরুত্ব অস্বীকার করেন না বটে; তবে জিহাদে অবতীর্ণ হওয়ার সময় নাকি এখনও হয়নি। উপরন্তু তারা বলে জিহাদ যখন ফরয হবে, আমিও তখন ঘরে বসে থাকব না, চলে যাব জিহাদের ময়দানে।

এ ধরনের লোকদের মনে এ কল্পনা-ই জাগ্রত হয়নি যে, কখনো

আমাকে ইসলাম বিরোধীদের মুকাবিলায় জিহাদে অবতীর্ণ হতে হবে। জিহাদকে একটি গবেষণার বিষয় হিসেবে তারা শত শত পৃষ্ঠা লিখেছেন, বক্তৃতার পর বক্তৃতা ঝেড়ে যাচ্ছেন। কিন্তু না তারা নিজেরা কখনো স্ব-শরীরে জিহাদের ময়দানে হাজির হওয়ার ইচ্ছা রাখেন, না অন্যদেরকে জিহাদে অংশগ্রহণের নসীহত করেন। কোন প্রস্তুতি-ই তারা নিচ্ছেন না। তাদের স্ব-প্রণীত শর্তপূরণ হলেও যে, তারা জিহাদে অংশ নিবেন না, তার আলামত স্পষ্ট। এসব হতভাগাদেরকে আল্লাহ বসিয়ে রাখেন মহিলাদের সাথে।

মোট কথা ঃ কুরআনের এই মূলনীতি দ্বারা জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণের গুরুত্ব জানা গেল যে, প্রস্তুতি ব্যতীত কোন ইচ্ছা গ্রহণযোগ্য নয়। কারো জিহাদের দায়িত্ব পালনের ইচ্ছা থাকলে সে এর জন্য স্ব-উদ্যোগে প্রস্তুতি গ্রহণ করবে অবশ্যই। ("মুসলমানদের সামরিক শক্তি" মাওলানা মাসউদ আযহার পৃ: ১৬)

পিতার উপর ছেলের জিহাদী প্রশিক্ষণের দায়িত্ব ঃ

وَاَخْرَجَ اِبْنُ اَبِي الدُّنْيَا فِىْ كِتَابِ الرَّمْيِ وَالْبَيْهَقِيُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقُّ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ اَنْ يُّعَلِّمَهُ الْكِتَابَةَ وَالسِّبَاحَةَ وَالرَّمْىَ - (بيهقى)

অর্থ ঃ হযরত আবু রাফে' (রাযি.) থেকে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন – পিতার উপর দায়িত্ব তার ছেলেকে লিখা, সাতার ও তীরান্দাজি (তীর নিক্ষেপ) শিক্ষা দিবেন। (বায়হাকী)

ফায়দা ঃ হাদীসটি থেকে জিহাদের প্রস্তুতি ও সমর বিদ্যার গুরুত্ব অনায়াসে বুঝে আসে যে, একজন সচেতন পিতার দায়িত্ব হল যে, তিনি নিজ সন্তানকে লিখা, সাঁতার এবং তীরনিক্ষেপ তথা রণক্ষেত্রে ব্যবহৃত নিক্ষেপণযোগ্য অস্ত্র-শস্ত্র শিক্ষা দিবেন বা শিক্ষার ব্যবস্থা করে দিবেন। এর

প্রত্যেকটি বস্তু, বিশেষ করে সাতার ও রণবিদ্যা জিহাদের ময়দানে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

وَعَنْ سَلَمَةَ بْنَ الْاَكْوَعِ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلٰى نَفَرٍ مِّنْ اَسْلَمَ يَنْتَضِلُوْنَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِرْمُوْا بَنِىْ اِسْمَاعِيْلَ! فَاِنَّ اَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا وَاَنَا مَعَ بَنِىْ فُلَانٍ قَالَ فَاَمْسَكَ اَحَدُ الْفَرِيْقَيْنِ بِاَيْدِيْهِمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَالَكُمْ لَا تَرْمُوْنَ؟ قَالُوْا كَيْفَ نَرْمِيْ وَاَنْتَ مَعَهُمْ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِرْمُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ كُلِّكُمْ - (بخارى شريف)

অর্থ ঃ হযরত সালমা বিন আক্ওয়া (রাযি.) হতে বর্ণিত যে, একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসলাম গোত্রের এমন কিছু লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম হন, যারা তীর নিক্ষেপণে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করছিল। হুযূর (স.) বললেন – হে ইসমাঈলের সন্তানেরা! খুব তীর নিক্ষেপ কর। কেননা, তোমাদের দাদা ইসমাঈল (আ.) দক্ষ তীরন্দাজ ছিলেন। (তীর নিক্ষেপণে খুব প্রতিযোগিতা কর।) আমি অমুক দলের সাথে রয়েছি। এটা শোনে দ্বিতীয় পক্ষ তীর নিক্ষেপ করা বন্ধ করে দিল। তখন রাসূল (স.) বললেন কী হল তোমাদের! তীর নিক্ষেপ করছ না যে? তারা বলল, কীভাবে নিক্ষেপ করব, আপনি তো তাদের পক্ষে চলে গেছেন? (অর্থাৎ আপনার বিপক্ষে কীভাবে তীর নিক্ষেপ করব এবং আপনি থাকার কারণে তারা এখন জিতে যাবে) হুযূর (স.) বললেন– তোমরা তীর নিক্ষেপ করতে থাক। আমি তোমাদের উভয় দলের সাথে রয়েছি। (বুখারী শরীফ খন্ড, ২পৃ: ৪০৬)

ফায়দা ঃ উল্লিখিত হাদীস দ্বারা এ কথা বুঝে আসে যে, সাহাবায়ে কিরাম সর্বদা সবধরনের অস্ত্রের প্রশিক্ষণের প্রতি গুরুত্বশীল ছিলেন এবং

তারা জিহাদী প্রশিক্ষণ নিয়েছেন।

সে যুগে এই জিহাদী প্রশিক্ষণ– প্রতিযোগিতা হত ঘোড়দৌড়, সন্তরণ, তীর–বল্লম নিক্ষেপণ ও তরবারী চালনার মাধ্যমে। কিন্তু বর্তমানে এই প্রশিক্ষণ–প্রতিযোগিতা চলে–কামান, রকেট, বিমান ও ট্যাংকের মাধ্যমে। এতে নাম ফুটানো, লোক দেখানো বা পক্ষপাতিত্ব ও শত্রুতা মূলক কিছু থাকে না, বরং জিহাদের প্রস্তুতি ও এতে অভিজ্ঞতা অর্জন করাই এর লক্ষ–উদ্দেশ্য, যা সুন্নাত ও কাম্য বস্তু। সমস্ত মুজাহিদের আনন্দের সহিত এতে অংশ গ্রহণ করা চাই। এমনিভাবে লাঠি, কংফু–কারাতে ইত্যাদি সব ধরনের প্রশিক্ষণ জিহাদের নিয়তে জায়েয ও উত্তম আমল।

মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় এসেছে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন– অচিরেই তোমাদের হাতে অনেক ভূখন্ড বিজিত হবে। আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য যথেষ্ঠ হয়ে যাবেন।

অতঃপর (সেই নিরাপত্তাকালীন সময়) তোমাদের কেউ যেন তীরান্দাজীর খেলায় অপারগ না হও। (বরং সেটাকে জারী রেখো।)

অন্য এক হাদীসে এসেছে– ধনুকে ফিতা ও গুণা লাগানো, অতঃপর তীর চালানোটা মানুষের পেরেশানীকে দূর করে দেয়।

তবরাণী'র অন্য এক রেওয়ায়েতে হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, যে, হুযূর (স.) ইরশাদ করেন– যখন মানুষ দুশ্চিন্তা ও দুঃখ–বেদনার শিকার হয়, তখন তার উচিত যে, সে এ দুশ্চিন্তা কে দূর করার নিমিত্তে ধনুকে তীর স্থাপন করবে এবং এর মাধ্যমে নিজের দুশ্চিন্তাকে দূরীভূত করবে।

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে–- তীর নিক্ষেপণ কে শক্ত করে ধর। কেননা, এটা তোমাদের উত্তম খেলা সমূহের মধ্য হতে একটি খেলা।

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে– ফিরেশতারা কোন ধরনের খেলায় উপস্থিত হন না, তবে শুধু মাত্র তীর নিক্ষেপণের খেলায় উপস্থিত হন।

হযরত ওমর ফারুক (রাযি.) হতে বর্ণিত– হুযূর আকরাম (স.) ইরশাদ করেছেন – সব ধরনের খেলাই বর্জনীয়। তবে নিজের স্ত্রীর সাথে চিত্ত-বিনোদন করাতে কোন খারাপী নেই এবং তীর নিক্ষেপ করার জন্য যেই নিশানা ঠিক করা হয়, এর মাঝে দৌড়া-দৌড়ি করাতে দোষের কিছু নেই। আর মানুষ নিজের ঘোড়াকে যে প্রশিক্ষণ দেয়, এটা দোষণীয় নয়।

(স্মরণ রাখা চাই যে, তীর নিক্ষেপণের ক্ষেত্রে দু'দিকে দু'টি নিশানা স্থাপন করা হয়। প্রত্যেক দল অপর দিকের নিশানায় টার্গেট করে। এর মাঝে দৌড়া-দৌড়ি করাকে নিশানার মাঝে দৌড়া-দৌড়ি বলা হয়েছে।)

যেমন-'মুগনী' নামক কিতাবে একটি রেওয়ায়েত নকল করা হয়েছে, হুযূর (স.) ইরশাদ করেছেন– দুই নিশানার মাঝের স্থানটুকু জান্নাতের উদ্যান সমূহের মধ্য হতে একটি উদ্যান।

তবরাণী শরীফের এক রেওয়ায়েতে এসেছে– যে ব্যক্তি দুশমনের দিকে তীর নিক্ষেপ করল, আর তা গিয়ে দুশমন পর্যন্ত পৌঁছলো। আল্লাহ তাআলা সে ব্যক্তির জন্য জান্নাতে একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। আর একটি মর্যাদার দূরত্ব একশত বছরের রাস্তা।

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে– যে ব্যক্তি আল্লাহর পথ তথা জিহাদে দুশমনের দিকে একটি তীর নিক্ষেপ করল, সে একটি গোলাম আযাদ করার সাওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি দুশমন পর্যন্ত তা পৌঁছিয়ে দিল, জান্নাতে তার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি হবে। বর্ণনাকারী সাহাবী বলেন যে, এ কথাটি হুযূর আকরাম (স.) তায়েফ যুদ্ধের সময় বলেছিলেন। সুতরাং আমি সে দিন ষোলটি তীর দুশমন পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়েছিলাম।

অপর এক হাদীসে এসেছে– যে ব্যক্তি ইসলামে বৃদ্ধ হয়েছে অর্থাৎ– মুসলমান থাকা অবস্থায় তার উপর বার্ধক্য এসেছে, এটা তার জন্য কিয়ামতের দিন জ্যোতি স্বরূপ হবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদে দুশমনের প্রতি তীর নিক্ষেপ করল, এটা তার জন্য মর্যাদার বিষয় হবে।

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে- যে ব্যক্তি দুশমনের দিকে তীর নিক্ষেপ করল, সে একটি দাস মুক্ত করার সাওয়াব পাবে। চাই সে তীর দুশমন পর্যন্ত পৌঁছুক বা না পৌঁছুক।

অপর এক বর্ণনায় এভাবে এসেছে– যে ব্যক্তি দুশমনের প্রতি তীর নিক্ষেপ করল, সে একটি দাস মুক্ত করার সাওয়াব পাবে। চাই তীর নিশানায় লাগুক বা না লাগুক।

ইবনে আসাকির এর এক বর্ণনায় এসেছে– হযরত আনাস (রাযি.) বলেন –হুযূর আকরাম (স.) ইরশাদ করেছেন– যে ব্যক্তি (জিহাদের উদ্দেশ্যে) আরবী ধনুক ও তার তুনীর বানিয়ে নিল, তবে আল্লাহ তাআলা

চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত তাঁকে অভাব-অনটন থেকে বাঁচিয়ে রাখবেন।

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে- হযরত ইবনে উমর (রাযি.) এক বার (তীরের) দুই নিশানার মাঝে দৌড়াচ্ছিলেন আর বলছিলেন, আমার কখন শাহাদাত নসীব হবে। আমার কবে শাহাদাত নসীব হবে।

অপর এক বর্ণনায় এসেছে যে, পারস্যের নগরী 'মাদায়েন' এ হযরত হুযায়ফা (রাযি.) দুই নিশানার মাঝে দৌড়াচ্ছিলেন এবং এ সময় তার পরনে লুঙ্গি ছিল না। (অর্থাৎ- সেলোয়ার বা এ জাতীয় কোন পোষাক ছিল।)

স্মরণ রাখা চাই যে, এই বর্ণনা গুলো এ বিষয়ের জন্য অকাট্য প্রমাণ বহন করে যে, সাহাবায়ে কিরাম অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে শারীরিক ব্যায়াম এবং যুদ্ধাস্ত্রের প্রশিক্ষণ ও ট্রেনিং গ্রহণ করেছেন। তীর নিক্ষেপ করা, অতঃপর নিশানার দিকে দৌড়ানো, এবং গতি বাড়ানোর জন্য স্ব-জোরে দৌড় দেওয়া, লুঙ্গি পরিধান না করা, এবং দেহ কে সব ধরনের কষ্ট সহ্য করণে অভ্যস্ত করে তোলা। এই সব কিছুই ছিল জিহাদের তরবিয়তের গুরুত্বের খাতিরে। অথচ সাহাবায়ে কিরাম ছিলেন হিদায়াতের উজ্জল মিনারা। দিক-নির্দেশনার আলোক রশ্মি। এবং উম্মতের উজ্জল নক্ষত্র তাঁরা ছিলেন দ্বীন-দুনিয়ার বাদশাহ্। যখন তারা ট্রেনিং ও অস্ত্র-প্রশিক্ষণ নেয়া ও দেয়ার প্রতি এতটুকু গুরুত্ব দিয়েছেন, তখন তাদের পর থেকে নিয়ে আগত কোন উম্মতের জন্য এই সুযোগ নেই যে, তারা ট্রেনিং বা প্রশিক্ষণ ব্যতীত থেকে যাবে। উলামায়ে কিরাম লিখেছেন যে, অস্ত্র প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। কারণ, যখন জিহাদ ফরয তখন অস্ত্রের প্রশিক্ষণও ফরয হবে। শাহ্ ইসমাঈল শহীদ (রহ.) ও হযরত আহমদ আলী লাহূরী (রহ.) বলেছেন যে, জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণের এই বিধান প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরয। ("দাওয়াতে জিহাদ" মাওলানা ফযল মুহাম্মদ পাকিস্তান পৃ: ২৬২-২৬৫)

ফায়দা ঃ বর্তমান যুগে ব্যবহৃত সকল অত্যাধুনিতক নিক্ষেপণ যোগ্য হাতিয়ার সমূহ উল্লিখিত হাদীস সমূহে বর্ণিত ফযীলতের অন্তর্ভূক্ত।

জিহাদের জন্য অস্ত্র সংগ্রহ ও প্রশিক্ষণের শরঈ বিধান

মহান আল্লাহ বলেন ঃ-

وَلْيَاخُذُوْا حِذْرَهُمْ وَاَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ تَغْفُلُوْنَ عَنْ اَسْلِحَتِكُمْ وَاَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيْلُوْنَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَّاحِدَةً - نساء - ١٠٢

অর্থ ঃ এবং তারা (মুসলমানরা) যেন নিজেদের সরঞ্জামাদী ও হাতিয়ার গুলো সাথে রাখে, (কেননা) কাফেররা চায় যে, তোমরা কোনভাবে তোমাদের সরঞ্জামাদী ও অস্ত্র-শস্ত্র থেকে বেখবর হয়ে যাও। যাতে তারা এক যোগে তোমাদেরকে আক্রমণ করে বসে। (সূরা–নিসা, আয়াত–১০২)

ফায়দা ঃ সম্মানিত পাঠক!

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে পবিত্র জিহাদের ফাযায়িল মাসায়িল এবং জিহাদের হাতিয়ার ও সরঞ্জামাদী প্রস্তুত করা সম্পর্কে বহু আয়াত রয়েছে। قتال কিতাল মূলধাতু দিয়ে ৭৯ স্থানে আল্লাহ তাআলা কিতাল ফী সাবীলিল্লাহ এর আলোচনা করেছেন এবং جهاد জিহাদ মূলধাতু দ্বারা ও প্রচুর আয়াত রয়েছে। যা না একজন সাধারণ মুসলমানও অস্বীকার করতে পারে, আর না কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি প্রতিরক্ষার এই বৃহত শক্তিটিকে এড়িয়ে যেতে পারে। আল্লাহ না করুন, যদি ইসলামে অস্ত্র উঠানো ও কাফির বে-দ্বীনদের হত্যা করা নিষেধ হত, তথাপি মুসলমানরা অবাধ্য হয়ে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা ও নিজেদের ইযযত-আব্রু রক্ষা করা এবং নিজেদের উপাসনালয় সমূহ সংরক্ষণ করার নিমিত্তে কাফির বে-দ্বীনদের সাথে লড়াই করার জন্য ময়দানে নেমে পড়ত। কিন্তু (আল-হামদুলিল্লাহ) ইসলাম এক স্বভাবগত ধর্ম। সে সম্পূর্ণরূপে মুসলমানদের ইয্যত আব্রু ও তাদের ইবাদতগাহ সমূহের হিফাযতের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। শুধু অনুমতি দিয়েছে তাই নয়, বরং বাতিলের মুকাবিলায় অস্ত্র উঠানো ফরয করে দিয়েছে। এবং বলে দিয়েছে যে, তোমরা একটি মুহূর্তের জন্য অস্ত্র থেকে উদাসীন হয়ো না। কারণ, কাফিররা এই অপেক্ষায়-ই আছে যে, তোমরা

তোমাদের হাতিয়ার থেকে গাফেল হয়ে যাও। তখনি তারা এক জোট হয়ে এক যোগে তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। আর আজ তার বাস্তবতাই পরিলক্ষিত হচ্ছে। আজ যখন মুসলমানরা নিজেদের প্রতিরক্ষা মূলক শক্তি ও অস্ত্র-শস্ত্র থেকে উদাসীন হয়েছে, তখন সমস্ত কুফরী শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুসলমানদের উপর চড়াও হয়েছে। মুসলমানদের এক-একটি ভূ-খন্ড তারা জবর দখল করে নিচ্ছে। আজ বহু রাষ্ট্রে মুসলমানরা নির্যাতিত। নির্যাতিতা মা--বোনদের আত্মচিৎকারে আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে আসছে। মুসলমানদের রক্তে রঞ্জিত আজ কাফের-বেদ্বীন, ইহুদী-খ্রীষ্টানদের নাপাক হাত। আর এ সব কিছু মুসলমানদের উদাসীনতার ফসল।

তাই সমস্ত মুসলমান বিশেষ করে উলামা সমাজের প্রতি অনুরোধ তাঁরা যেন জিহাদী অস্ত্র-শস্ত্র ও সরঞ্জামাদী সম্পর্কে উদাসীনতার পরিচয় না দেন এবং সাধারণ মানুষকে সর্বদা উদ্বুদ্ধ করার মহান দায়িত্ব পালন করে যান। আল্লাহ তাআলা আমাদের তাওফীক দান করুন-আমীন

জিহাদের প্রশিক্ষণ সম্পর্কে কয়েক খানা হাদীস

عَنْ خَالِدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ كُنْتُ رَجُلاً رَامِيًا فَكَانَ يَمُرُّبِىْ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ، فَيَقُوْلُ يَا خَالِدُ! اُخْرُجْ بِنَا نَرْمِىْ فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ اَبْطَأْتُ عَنْهُ فَقَالَ يَاخَالِدُ ! تَعَالْ اُخْبِرْكَ مَاقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ - قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ - اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلاَثَةَ نَفَرٍ اَلْجَنَّةَ - صَانِعَهٗ يَحْتَسِبُ فِىْ صَنْعَتِهِ اَلْخَيْرَ وَالرَّامِىْ بِهٖ وَمُنْبِلِهٖ - وَارْمُوْا وَارْكَبُوْا وَاَنْ تَرْمُوْا اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ تَرْكَبُوْا وَلَيْسَ مِنَ اللَّهْوِ اِلاَّ ثَلاَثٌ تَادِيْبُ الرَّجُلِ فَرَسَهٗ وَمُلاَعِبَتُهٗ اَهْلَهٗ وَرَمْيُهٗ بِقَوْسِهٖ وَنَبْلِهٖ وَمَنْ تَرَكَ

الرَّمْيَ بَعْدَ مَا عَلِمَهُ رَغْبَةً عَنْهُ فَإِنَّهَا نِعْمَةٌ تَرَكَهَا أَوْ قَالَ كَفَرَهَا - (رواه ابو داود)

অর্থ ঃ হযরত যায়েদ বিন খালেদ বলেন– আমি তীর নিক্ষেপে পারদর্শী এক ব্যক্তি ছিলাম। উক্‌বা বিন আমের (রাযি.) আমার কাছে আসত এবং বলত-চল খালেদ আমাদের সাথে, আমরা তীর নিক্ষেপ করব। এক দিন আমি বের হতে একটু দেরী করলাম। তখন উকবা আমাকে বলল– এসো খালেদ! আমি তোমাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এক খানা হাদীস শোনাব। হুযূর (স.) বলেছেন–– অবশ্যই আল্লাহ তাআলা একটি তীরের মাধ্যমে তিনজন ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। এক. তীরের কারিগর যে, তীর বানাতে গিয়ে সাওয়াবের নিয়ত রাখে। দুই. (জিহাদের ময়দানে দুশমনের দিকে) তীর নিক্ষেপ কারীকে। তিন. (লড়াইয়ের ময়দানে) মুজাহিদের হাতে তীর তুলে দেয় যে। (যেমন, বর্তমানে রকেট লাঞ্চার চালনাকারীর সাথে রকেট হাতে তুলে দেয়ার জন্য একজন সাহায্যকারী থাকে বা মুজাহিদদের সাথে তাদের বন্দুকের মেগজিন ভরে দেয়ার জন্য যে থাকে। এদের সবার জন্য এই সু-সংবাদ।) তোমরা (অনুশীলন ও ট্রেনিং এর সময়) তীরও নিক্ষেপ করো এবং ঘোড়ার উপরও আরোহণ করো। তোমাদের তীর নিক্ষেপ করাটা আমার কাছে ঘোড়ায় আরোহণের চেয়ে বেশী প্রিয়।

জেনে রাখো! মানুষের সব ধরনের খেলা-ধুলা অনর্থক। তবে তিন ধরনের খেলা-ধুলা বৈধ। এক. কোন ব্যক্তির তার ঘোড়াকে (রণ) প্রশিক্ষণ দেয়া। দুই. নিজ স্ত্রীর সাথে চিত্ত-বিনোদন করা। তিন. নিজ ধনুকের মাধ্যমে তীর চালনা করা। আর যে ব্যক্তি তীর চালনা শিক্ষা করার পর অগ্রাহ্যতাবশত তা ভুলে গেল, তবে সে একটি নিয়ামতকে (অকৃতজ্ঞতা বশত) ছেড়ে দিল। অথবা- বলেছেন নিয়ামতের না শুকরী করল। (আবুদাউদ শরীফ, খন্ড ১পৃ: ৩৪০) ("দাওয়াতে জিহাদ" মাওলানা ফযল মুহাম্মদ সাহেব, পাকিস্তান পৃ ঃ ২৬১)

ফায়দা ঃ এই হাদীসে রাসূল (স.) তীর নিক্ষেপণও ঘোড়ার প্রশিক্ষণ

করা এবং এতে পারদর্শী হওয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। এ সবগুলো জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার অন্তর্ভূক্ত।

এ হাদীসটি হতে একথাও জানা গেল যে, কেউ যদি জিহাদের নিয়তে তীর বানায় অথবা বর্তমান আধুনিক বিশ্বে ব্যবহৃত অস্ত্র-শস্ত্র প্রস্তুত করে, এগুলো বানানোর পদ্ধতি শিক্ষা করে, তবে সে মুজাহিদের সাওয়াব পাবে, জান্নাতের অধিকারী হবে এবং যে অস্ত্র প্রস্তুত করে মুজাহিদের হাতে তুলে দিবে সেও জান্নাতে প্রবেশ করবে। অতঃপর বলা হয়েছে যে, জিহাদের প্রশিক্ষণ এবং এতে দক্ষতা অর্জন করা আল্লাহর এক নিয়ামত এবং একে ভুলে যাওয়া আল্লাহর নিয়ামতের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ। (আল্লাহ আমাদের হিফাযত করুন - আমীন)

উচ্চতর যুদ্ধাস্ত্রের প্রশিক্ষণের জন্য সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.) এর দূর-দুরান্তের সফর ঃ

মুফতী শফী (রহ:) নিজ পুস্তিকা 'জিহাদ' এ লিখেন– হাদীস শাস্ত্রের ইমাম ইবনে কাসীর (রহ.) নিজ ঐতিহাসিক গ্রন্থ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া'য় হুঁনায়িন যুদ্ধের অধীনে লিখেন যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দু'জন সাহাবী-হযরত উরওয়া ইবনে মাসউদ ও গাইলান বিন আসলাম (রাযি.) নবীজির সাথে হুনায়িনের যুদ্ধে এজন্য শরীক থাকতে পারেননি যে, তাঁরা কিছু যুদ্ধাস্ত্র তৈরীর পদ্ধতি শিখতে দামেস্কের প্রসিদ্ধ শিল্প নগরী 'যারাশ' এ গিয়ে ছিলেন। যেহেতু সেখানে দাব্বাবা (ট্যাংক) ও যব্বুর নামের বড় বড় গাড়ি তৈরী করা হত, যার দ্বারা সে সময় আজকের ট্যাংকের কাজ নেয়া হত। এমনিভাবে মিনজানিকের কারিগরিও ছিল, যদ্বারা কিল্লার উপর ভারী ভারী পাথর নিক্ষেপ করে কিল্লা বিধ্বংসী কামানের কাজ নেয়া হত। এ সকল কারিগরি বিদ্যা অর্জন করার জন্য সে সকল ব্যক্তিগণ সিরিয়া গিয়েছিলেন।

এ ঘটনা দ্বারা এটিও প্রমাণিত হল যে, মুসলমানদের জন্য জরুরী হল– তারা নিজের দেশকে হাতিয়ার ও যুদ্ধাস্ত্র দ্বারা স্বনির্ভর করে তুলবে। অন্যের মুখাপেক্ষী থাকবে না। নতুবা তাদের পক্ষে সে সব দেশ থেকে এসব গাড়ি ও মিনজানিক ক্রয় করে নিয়ে আসাও সম্ভব ছিল, কিন্তু রাসূল (স.) ও

সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.) এর উপর ক্ষান্ত হননি। বরং (তৈরী করার যোগ্যতা অর্জন করে) নিজ দেশে তা তৈরীর ব্যবস্থা করেছেন। আমাদের কর্তব্য হল এ ব্যাপারে পুরোপুরী চিন্তা ভাবনা করা।

রাসূল (স.) এর তো রূহানী ও খোদা প্রদত্ত শক্তি ও সাহায্য অর্জিত ছিল, যা থাকতে জাগতিক হাতিয়ারের বিন্দুমাত্র প্রয়োজন ছিল না। এতদসত্ত্বেও তিনি (হাতিয়ার তৈরীর) এত গুরুত্বারোপ করেছেন। সে ক্ষেত্রে আমাদের মত গোনাহগার ও দুর্বল ঈমানদার লোকদের জন্য এর প্রয়োজন কতটুকু হবে? (তা সহজেই অনুমেয়)

(তাই) বর্তমান যুগে যুদ্ধের জন্য যত প্রকারের হাতিয়ার, সরঞ্জামাদী ও মারণাস্ত্রের প্রয়োজন রয়েছে তার কোনটা থেকেই আমাদের পিছ পা না হওয়া উচিত। আর এরই সাথে সাথে চেষ্টায় লেগে যাওয়া চাই, যেন অতি শীঘ্রই সেগুলো নিজ দেশে তৈরী করা যায় এবং নিজ দেশকে স্বনির্ভর করে গড়ে তোলা যায়। ("জিহাদ" মুফতী শফী (রাহঃ) পৃঃ ১৫, দাওয়াতে জিহাদ মাওলানা ফযল মুহাম্মাদ সাহেব, পাকিস্তান পৃঃ ২৪৯)

ফায়দা ঃ উক্ত ঘটনা থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেল যে, যে যুগে যে ধরনের যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহৃত হয়, সেগুলো শিক্ষা করা এবং উচ্চ থেকে উচ্চতর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এ ব্যাপারে দক্ষতা সম্পন্ন হয়ে উঠা একজন মুসলমানের অন্যতম দায়িত্ব। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে নিজ দেশে সেগুলো শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকলে অন্য দেশে সফর করে তা শিখে এসে নিজ দেশের মানুষকে তার প্রশিক্ষণ দেয়া এবং নিজেরা এ ব্যাপারে স্বনির্ভর হয়ে উঠা গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। যেন প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুদের দাঁত ভাঙ্গা জবাব দেয়া যায়।

(আল্লাহ তাআলা আমাদের তাওফীক দান করুন-আমীন)

যুদ্ধাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তার উপর মাওলানা নূর মুহাম্মাদ দানা সাহেবের বক্তব্য

সূরা হাদীদ এর ২৫নং আয়াতের তফসীরে মাওলানা নূর মুহাম্মাদ সাহেব উজিরিস্তানী নিজ বই 'জিহাদে আফগানিস্তান' এ জিহাদের প্রস্তুতির জন্য হাতিয়ারের প্রয়োজনীয়তার উপর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এর

কিছু অংশ এখানে দ্রষ্টব্য ঃ

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে কিছু পাওয়ার জন্য সঠিক পথে পা বাড়াতে গিয়ে ভুল করেছে, সে নিশ্চয় আল্লাহর দান থেকে বঞ্চিত থাকবে। যদিও সে আল্লাহর উপর ঈমান মজবুত করার জন্য বহু অনুশীলন ও মুজাহাদা করেছে। অথচ বাস্তবে ঈমানের পরিপক্বতা ও পরিপূর্ণতা তো এটাই যে, আল্লাহ তাআলা থেকে পাওয়ার জন্য মানুষ সে পথেই চলবে, যার উপর চলে উদ্দেশ্য অর্জন করতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স.) মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। আর যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহর বাতানো পথ থেকে সরে গিয়ে অন্য কোন পন্থায় আল্লাহ থেকে পেতে চায়, তবে সেটা ঈমানের পরিপক্বতা নয়, বরং তা ঈমানের দুর্বলতার পরিচয়।

উদাহরণ স্বরূপ, কোন ব্যক্তির পিপাসা লেগেছে। কূপ, রশি এবং বালতিও মজুদ রয়েছে। কিন্তু এই তাওয়াক্কুলকারী যদি পিপাসা নিবারণের জন্য মসজিদের দিকে অগ্রসর হয় এবং নফল নামায, যিকির -আযকার ও ঈমানের পরিপক্বতার কাজে লিপ্ত হয়ে পিপাসা নিবারণের চেষ্টা করে, তবে অবশ্যই এই তাওয়াক্কুলকারী মৃত্যুর মুখে পতিত হবে এবং আত্মহত্যার শিকার হয়ে আল্লাহর শাস্তিরযোগ্য হবে। কারণ, তার যখন জানা রয়েছে, দেখা রয়েছে যে, পিপাসা নিবারণের বৈশিষ্ট্য আল্লাহ তাআলা পানির মধ্যে রেখে দিয়েছেন এবং আল্লাহ তাআলা তাকে পানি গ্রহণের উপকরণসমূহ যুগিয়ে দিয়েছেন তার সামান্য চেষ্টা ও হিম্মত দ্বারা সে তা অর্জনও করতে পারত। কিন্তু সে এটাকে ছেড়ে মো'জেযা ও অলৌকিক পন্থায় পিপাসা নিবারণের পিছনে পড়েছে। তাই হয়ত তার দেমাগে বক্রতা রয়েছে অথবা তার উপর কেরামতি ও মো'জেযা দেখানোর ভুত সওয়ার হয়েছে।

ঠিক অনুরূপভাবে বুঝে নাও যে, লোহার ভেতর যে জঙ্গী বৈশিষ্ট রয়েছে তা কুরআন স্পষ্ট করে দিয়েছে। দুশমনের মুকাবিলা ও জিহাদের ময়দানে বিজয় অর্জনের বৈশিষ্ট্যতা আল্লাহ তাআলা লোহার ভেতর রেখে দিয়েছেন। তাই তোমাদের যখন প্রয়োজন হবে যে, তোমরা দুশমনদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করবে এবং আল্লাহ তোমাদেরকে দুশমনের উপর বিজয় দান

করবেন, তবে তোমরা লোহা -নিক্ষেপণের শক্তির প্রতি মনোনিবেশ কর। এবং সামর্থ্যানুযায়ী সে শক্তি অর্জন করতে কুন্ঠাবোধ করবে না।

এখন যদি কোন জাতি এই কুরআনী দিক-নির্দেশনাকে পেছনে নিক্ষেপ করে শুধু ইবাদত ও ঈমানের পরিপক্কতার মাধ্যমে দুশমনের উপর বিজয় লাভ করতে চায়, তবে তারা যে শুধুমাত্র কুরআনের নাফরমানী করছে তাই নয়, বরং দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানে নিজেকে ধ্বংস করার চেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। ("জিহাদে আফগানিস্তান" মাওলানা নূর মুহাম্মাদ দানা সাহেব পৃঃ ২৩৭) ("দাওয়াতে জিহাদ" পৃঃ ২৫৯)

رَوَى الْإِمَامُ مُسْلِمٌ رح بِسَنَدِهٖ اَنَّ فُقَيْمًا اَللَّخْمِيُّ قَالَ لِعُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ تَخْتَلِفُ بَيْنَ هٰذَيْنِ الْغَرَضَيْنِ وَاَنْتَ كَبِيْرٌ يَشُقُّ عَلَيْكَ قَالَ عُقْبَةُ : لَوْ لَا كَلَامٌ سَمِعْتُهٗ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ اُعَانِيْهِ قَالَ الْحَارِثُ فَقُلْتُ لِابْنِ شَمَّاسَةَ وَمَا ذَاكَ قَالَ اِنَّهٗ قَالَ - مَنْ عَلِمَ الرَّمْىَ ثُمَّ تَرَكَهٗ فَلَيْسَ مِنَّا اَوْقَدْ عَصٰى - (مسلم شريف)

অর্থ ঃ ইমাম মুসলিম (রহঃ) নিজ সনদ- সূত্রে বর্ণনা করেন যে, ফুকাইম (রহঃ) হযরত উকবা ইবনে আমের (রাযিঃ) কে লক্ষ করে বললেন যে, আপনি এই দুই নিশানার মাঝে দৌড়াচ্ছেন অথচ আপনিতো বৃদ্ধ। আপনার জন্য তো এটা কষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তিনি বললেন, আমি যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এক (সতর্ক) বানী না শোনতাম, তবে আমি এই কষ্ট সহ্য করতাম না। (এই হাদীসের এক বর্ণনাকারী) হারিস বলেন, আমি ইবনে সাম্মাছাকে জিজ্ঞাস করলাম সে (সতর্ক) বানীটি কি? তিনি উত্তর দিলেন যে, হুযূর (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি তীরান্দাজি (তীর নিক্ষেপণ) শেখার পর তা ছেড়ে দিল, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। কিংবা বলেছেন সে নাফরমান"। (মুসলিম শরীফ খন্ড ২ পৃঃ ১৪৩)

ফায়দা ঃ হাদীসটি থেকে জিহাদের প্রস্তুতি এবং সমর বিদ্যার গুরুত্ব

অনায়াসে বুঝে আসে। জিহাদ এমন এক আমল যার প্রশিক্ষণ নেয়ার পর ভুলে যাওয়ার উপর নবী কারীম (স.) ভীতি প্রদর্শন করেছেন। তাই তো এ হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত উকবা বিন আমের (রাযিঃ) এ বৃদ্ধ বয়সেও তীরের দুই নিশানার মাঝে দৌড়া-দৌড়ি করেছেন।

ধনুক হাতে দুনিয়া ত্যাগ

ইমাম যাহাবী (রহঃ) 'তাহযীব' নামক গ্রন্থে আবু আবদিল্লাহ– যিনি ইবরাহীম ইবনে আদহাম এর বন্ধু ছিলেন তাঁর থেকে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, একবার হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহঃ) সামুদ্রিক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। আগে বাড়তে বাড়তে আমাদের সমস্ত সাথীদের চেয়ে বহু আগে চলে গেলেন। সেখান থেকে ফিরে আসা সাথীরা বলেছে যে, যে দিন ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহঃ) এর ইন্তেকাল হয় সে রাতে তিনি পঁচিশ বার বাথরুমে গিয়েছিলেন। যখন তার ইয়াকীন হয়ে গেল যে, এখন মৃত্যু উপস্থিত, তখন তিনি কিছু সাথীকে বললেন যে, আমার জন্য ধনুকে তীর স্থাপন কর। যখন ধনুক প্রস্তুত করা হয় তখন তিনি সেটা মজবুত করে হাতে ধরেন। এবং তাঁর হাতে ধনুক থাকা অবস্থায়ই তার রূহ বের হয়ে যায়। (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন) (দাওয়াতে জিহাদ পৃঃ২৬৯)

بناكر دند خوش رسمے بخاك وخون غلطيدن +

خدا رحمت كند ايں عاشقان پاك طينت را —

অর্থ ঃ 'তাঁরা মাটি ও রক্তে লুটোপুটি খাওয়ার এক অপূর্ব প্রথা প্রতিষ্ঠা করেছেন। মহান আল্লাহ সৎ প্রকৃতি সম্পন্ন এ প্রেমিকদের উপর রহমত বর্ষণ করুন।'

জিহাদের ময়দানে নখ বড় রাখা

নখ খাট রাখা নবী (আঃ) দের সুন্নাত। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি তাগিদ করেছেন। তবে জিহাদের বিষয়টি একটু ভিন্ন। এখানে প্রয়োজনের খাতিরে এমন কিছু কাজ জায়েয যা অন্য ক্ষেত্রে নাজায়েয। যেমন, মুজাহিদের জন্য মোঁচ বড় রাখা। কাফিরকে ভীত-সন্ত্রস্ত

করার নিয়তে দাড়িতে কালো খিযাব ব্যাবহার করা। দেহের হিফাযতের জন্য রেশমী কাপড় পরিধান করা। ময়দানে শত্রুকে সব ধরনের ধোঁকা দেয়া ইত্যাদি। এর মধ্য হতে একটি হল হাত-পায়ের নখ বড় রাখা। যা মুজাহিদদের জন্য বৈধ।

যেমন হাদীসে এসেছে

وَعَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَنْ لاَّ نَحْفِىَ الْاَظْفَارَ فِىْ الْجِهَادِ فَاِنَّ الْقُوَّةَ فِىْ الْاَظْفَارِ ـ (مغنى)

অর্থ ঃ হযরত হাকাম বিন আমর (রাযি) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে, রাসূল (সাঃ) আমাদেরকে জিহাদের সময় নখ খাট না করার নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা, নখও (অস্ত্রের ন্যায়) এক শক্তি । (মুগনী)

অপর এক হাদীসে এসেছে

عَنْ اَبِىْ بَكْرِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَشْيَاخِهٖ قَالَ ، قَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَفِرُّوْا اَلْاَظْفَارَ فِىْ اَرْضِ الْعَدُوِّ فَاِنَّهَا اَلسِّلَاحُ -

(مصنف ابن ابى شيبه)

অর্থ ঃ আবু বকর ইবনে আবদিল্লাহ তাঁর শায়খদের নিকট থেকে বর্ণনা করেন, হযরত উমর (রাযিঃ) (মুজাহিদদেরকে) নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা (জিহাদের সময়) দুশমনের এলাকায় থাকা কালীন নিজেদের নখগুলোকে লম্বা রাখো। কেননা, এটাও এক ধরনের অস্ত্র। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাহ)

ফায়দা ঃ উল্লিখিত দুইটি হাদীস দ্বারা একথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, মুজাহিদদের জন্য জিহাদের ময়দানে নিজের নখ বড় রাখা বৈধ।

কুরআন ও হাদীসের আলোকে
জিহাদী প্রশিক্ষণের গুরুত্ব
মাওলানা মুহাম্মদ ওমর ফারুক।

প্রকাশনায়
রাহ্‌নুমা পাবলিকেশন্স

মূল্য ঃ ১৬ (ষোল) টাকা মাত্র।

আমাদের প্রকাশিত আপনাদের
সংগ্রহে রাখার মত ক'টি বই
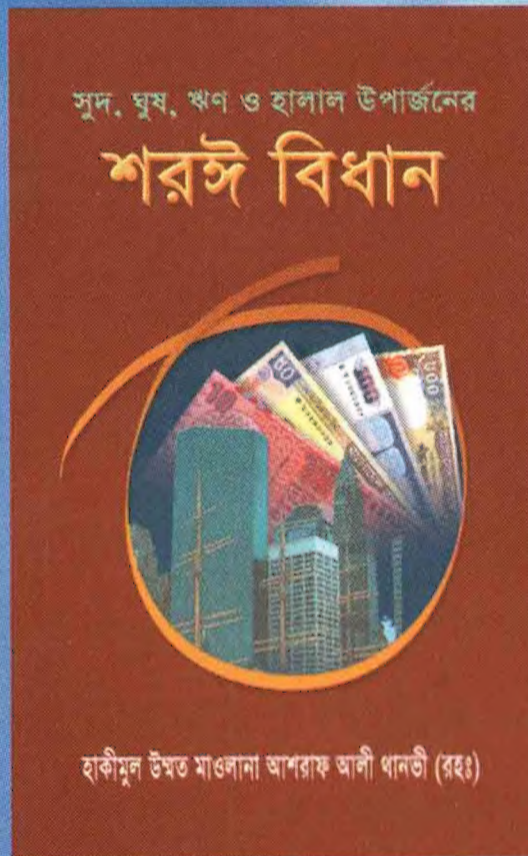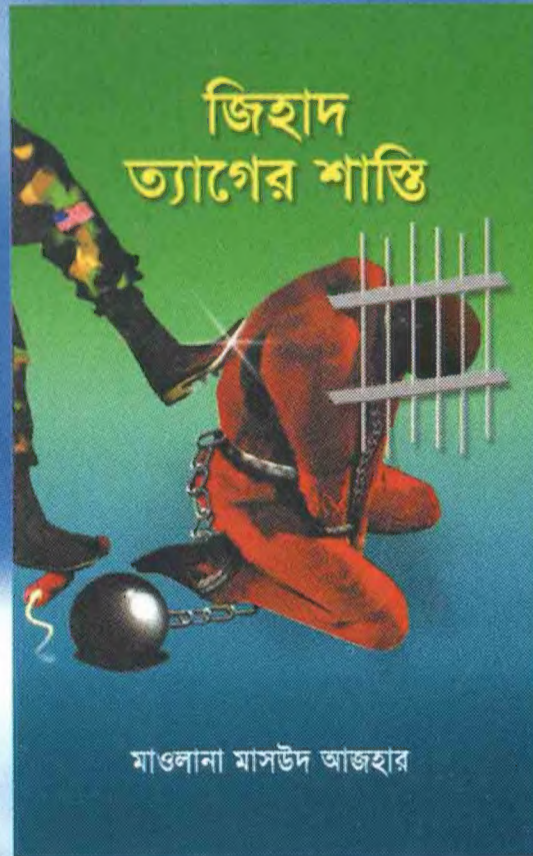
রাহনুমা পাবলিকেশন্স
অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান